কবিগু(ও বিজ্ঞান

-- বিপুল সাহা

১।

রবীন্দ্রনাথ বললে আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে একজন কবিকে। তিনি নিশ্চিতরূপে সর্বাগ্রে কবি তারপর গল্পকার নাট্যকার প্রাবন্ধিক গীতিকার সুরকার চিত্রকর দার্শনিক ইত্যাদি অনেক কিছু। সেকারণে আমরা তাঁকে কবিগু(পদে বরণ করেছি। কাব্য-চা(শিল্প কল্পনার ডানায় ভর করে চলে যেখানে বহমান নানা ভাবের আবর্ত। সংবেদনশীল কবিমানসে দোলা দেয় একটি ভাব নয়, নানাবিধ ভাবনা -বি(্বজগত, মানবসমাজ, স্বদেশ, ঐতিহ্য, মাতৃভাষা, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি নিয়ে ভাবনা। এমন কি বিজ্ঞানভাবনাও।

বিজ্ঞান জাতীয় বিষয়সমূহ ভাববাদী ভাবনার বিপরীত মে(তে অবস্থান করে। তথাপি কবিগু(রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়কর রকমের বিজ্ঞান সচেতন ছিলেন। সেকথা আজ আর নতুন কথা নয়। আশ্চর্য মেধায় তিনি বিপরীতধর্মী দুই ভাবনার সহাবস্থানেও স্বস্তিতে ছিলেন এবং দুয়ের সামঞ্জস্য র(া করেছিলেন।

ব্রাহ্ম পরিমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করে তিনি পারিবারিক ব্রাহ্মমতকে স্বীকার করে নিয়েও তেমন করে সীমাবদ্ধ ছিলেন না সম্প্রদায়গত ভাবনায়। '.. যে পিতৃবি(্বাসে তাঁর উত্তরাধিকার তার মধ্যে একদিকে যেমন তীব্র পশ্চিমী ভাব ছিল অনুপস্থিত, অন্যদিকে তেমনি সেই ব্রাহ্ম আবহাওয়া দেশাচার ও প্রচলিত-সংস্কার-প্রীতি থেকে অনেকাংশে মুক্ত(ছিল বলা যায়।' (বাংলার রেনেসাঁস) এই উদার এবং মুক্ত(পরিবেশ তাঁকে স্বাধীন ভাবনার স্তরে উন্নীত হতে প্রভূত সাহায্য করেছিল যেখানে বিজ্ঞানসুলভ ভাবনার সুগন্ধও ছিল।

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিলেন সে সম্পর্কে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর একটি উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য। একটি চিঠিতে তিনি কবিবন্ধুকে লেখেন - 'তুমি যদি কবি না হইতে তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইতে পারিতে।' যখন একজন বিজ্ঞানী এ কথা বলেন একজন কবি সম্পর্কে তখন তার মর্মার্থ বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে। বিজ্ঞানী এই মন্তব্য করেছেন কবির বিজ্ঞানসুলভ মানসিকতার জন্যে। আমরা সচেতন যে অনেকেই বিজ্ঞান কর্তৃক আবিষ্কৃত তথ্যভাণ্ডারের খোঁজখবর রাখেন কিন্তু তাদের চিন্তাধারা বিজ্ঞানসুলভ থাকে না। রবীন্দ্রনাথের নিষ্ঠা ছিল সত্য ও যুক্তি(র প্রতি। সেই সঙ্গে ছিল সংস্কারমুক্ত(উদার মানসিকতা ও প্রবল জ্ঞানলিপ্সা। বিজ্ঞানী উক্ত(মন্তব্যে কবিবন্ধুর এই দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছেন বলেই মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার পরিমাণ সামান্যই। একান্তভাবে তা থেকে তাঁর বিজ্ঞান-মনস্কতার যথার্থ সা(্য মেলে না। এ বিষয়ে তাঁর কাব্য ও অন্যান্য রচনার মধ্যে এবং কর্মজীবনে খোঁজখবর করা প্রয়োজন।

২।

বারো-তেরো বছর বয়সে জীবনের প্রথম যে প্রবন্ধটি তিনি লেখেন সেটি বিজ্ঞানবিষয়ক। তার নাম 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি'। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। পরে তিনি নিজেই সোচ্চার হয়ে বলেছেন - 'জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।' (বি(্বপরিচয়, ভূমিকা) চার বছর পরে ভারতী পত্রিকায় লেখেন 'সামুদ্রিক জীব'। পরবর্তী ১৫/১৬ বছর ধরে বালক ও সাধনা পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক বিবিধ রচনা প্রকাশিত হয় যেগুলি রবীন্দ্রনাথ লিখিত বলেই অনুমান।

বাল্যকালে বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কথা তিনি নিজেই বিস্তারে বর্ণনা করে যান। এবিষয়ে প্রাথমিক উৎসাহ বাড়ে সীতানাথবাবু এবং অঘোরবাবুর সান্নিধ্য থেকে। জল উত্তপ্ত হলে পরিচালন প্রক্রি(য়ায় জলকণার মধ্যে চক্র(াকার গতিময়তা ল(্য করা যায় - পরী(া করে তা দেখে তাঁর রোমাঞ্চ জেগেছিল। কণ্ঠ থেকে কি করে শব্দ উৎপন্ন হয় তা জানতে বসে অবশ্য তিনি রোমাঞ্চিত হতে পারেন নি। কণ্ঠ ও কণ্ঠজাত শব্দের উৎপত্তির মধ্যে নিছক বস্তুনিষ্ঠ ব্যাপারটা তাঁর মনঃপূত হয় নি। বিজ্ঞানে কণ্ঠ থেকে শব্দ উৎপন্ন হওয়া আছে বটে এবং সত্যিই তা রোমাঞ্চকর, কিন্তু আরো মধুর বার্তা হল - কণ্ঠে কথা আছে, সুর আছে এবং তার প্রতি গায়ক-কবির আকর্ষণ অধিক। সেখানে তাঁর কবিমনেরই প্রাধান্য।

জীবনস্মৃতিতে তিনি স্মরণ করেছেন - সদর স্ট্রীটে জ্যোতিদাদার সঙ্গে বসবাস করার সময়ে তাঁর বিজ্ঞানপাঠে গভীর আগ্রহ জন্মেছিল। তখন তিনি টমাস হক্সলির রচনা থেকে জীবতত্ত্ব এবং লকইয়ার নিউকম্ব থেকে জ্যোতিষ্ক তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হন। ডালহৌসি পাহাড়ে বসে তিনি পিতার কাছ থেকে সানন্দে পাঠ নিতেন আকাশ পর্যবে(ণের। বাড়ি ফিরে পড়েছেন প্রেক্টোরের 'হ্যাণ্ডবুক অব স্টার্স'। উক্ত(জ্ঞানজিজ্ঞাসার ফসল তেরো বছর বয়সের পূর্বোক্ত(প্রবন্ধটি। তিনি পাঠ করেছিলেন রবার্ট বলের 'দ্য স্টোরি অব হেভেনস', হেল্‌ম্‌হোলৎসের 'পপুলার লেকচার্স অন সায়েন্টিফিক সাবজেক্টস', যুলিযুস জাখস-এর

'টেক্সট বুক অব বটানি' এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের বই। । বড়ো হয়ে পড়েছেন জেমস জীনসের, আর্থার এডিংটনের এবং জর্জ গ্যামোর বই। পত্রপত্রিকা এবং নানা জ্ঞানীগুণীজনের সঙ্গে আলাপচারিতা থেকে কতটা বিজ্ঞানশি(া নিয়েছেন তা আর জানার উপায় নেই। মুক্ত(কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন 'আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস-আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না।' (বি(পরিচয়, ভূমিকা) কাব্যরসের সঙ্গে বিজ্ঞানরস আস্বাদনের নজির মানব সমাজে খুব সুলভ নয়।

।। ৩ ।।

বারো-তেরো বছরের পরে একেবারে তিয়াত্তর বছরে পৌঁছে তিনি লিখতে বসলেন 'বি(পরিচয়'(১৯৩৭)। ততদিনে অজস্র কাব্য-নাটক-গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-গান লিখেছেন এবং নোবেল সম্মানে (১৯১৩) ভূষিত হয়েছেন। তবে বার্ধক্যবেলায় বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা লিখতে বসলেন কেন?

বোলপুরে মহর্ষির আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০১ সালে এবং ১৯২১ সালে বি(ভারতী। মানবমনের সার্বিক বিকাশের ল(্যে তিনি চিরাচরিত প্রথা অগ্রাহ্য করে নতুন ধরণের শি(ায়তন প্রবর্তন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এবং তা করতে বসে লোকশি(ার জন্য বিজ্ঞানশি(া যে একান্ত প্রয়োজন সেকথা বিশেষভাবে অনুভব করেন। 'শি(া যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।' (বি(পরিচয়, ভূমিকা) সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে প্রবীন বয়সেও প্রভূত পরিশ্রম করে বি(পরিচয় লিখতে বসা।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে বি(পরিচয় শুধু শি(ার্থীদের জন্যে নয় 'এই লেখার ভিতর দিয়ে আমার নিজেকেও শি(া দিয়ে চলতে হয়েছে।' (ঐ) সাতাত্তর বছর বয়সে পৌঁছেও কবি রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বিজ্ঞানশি(া দিতে উৎসাহী থেকেছেন - এই ঘটনা বিজ্ঞানসম্পর্কে তাঁর আজন্মলালিত (ধার্ত মনোভাবটি প্রকাশ করে। জগদীশচন্দ্র তা অনুভব করেছিলেন।

তিনি ল(্য করেছেন পাশ্চাত্য দেশে বৈজ্ঞানিক উর্বরতা কিভাবে তাদের সমৃদ্ধ করেছে আর এদেশে তার অভাব ও দৈন্য এবং অন্ধবি(াসের মূঢ়তা বিদ্যার (ে ত্রে ও কাজের (ে ত্রে আমাদের কী নিদা(ন অকৃতার্থ করে রেখেছে। তা নিয়ে প্রবল আ(েপ করেছেন। 'বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিষগুলো কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের (ে ত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রেখেছে।' (ঐ) যথার্থ বিজ্ঞানভাবনার অভাব কিন্তু আমাদের আজো কাজের (ে ত্রে অকৃতার্থ করে রেখেছে অনেকটাই।

বিজ্ঞানের দুটি বিষয় তাঁকে খুব আকৃষ্ট করেছিল - জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান। তাঁর পঠিত এবং সংগৃহীত বইয়ের তালিকা আর স্বীকারোক্তি(থেকে তা স্পষ্ট। সেই সঙ্গে ভূবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, পরিবেশ চিন্তাও তাঁর ভাবনায় ছিল। প্রাণীবিদ্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রবল আগ্রহের কারণে পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং জামাতা নগেন্দ্রনাথকে তাঁর সহধর্মিণীর সমস্ত গহনা-গাঁটি বিক্রি(করে সেই টাকায় বিদেশে পাঠিয়েছিলেন কৃষি ও প্রাণীবিদ্যা সম্পর্কে শি(ালাভের জন্যে। মূল উদ্দেশ্য শান্তিনিকেতনে শি(াদানের কাজে তা ব্যবহার করা।

তিনি সচেতন ছিলেন যে পড়তে পড়তে যা শেখা হয়েছে 'তাকে পাকা শি(া বলে না'। কিন্তু একথাও সত্য যে 'ক্র(মাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।' এই বৈজ্ঞানিক মেজাজটাই আসল কথা। এই বৈজ্ঞানিক মেজাজের জন্যই 'অন্ধবি(াসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে র(া করেছে।' কবি হয়েও তাঁকে বিজ্ঞানমনস্ক থাকতে সাহায্য করেছে। 'অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করি নে।' (ঐ) এখানেই রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব। অন্ধবি(াসের মূঢ়তা থেকে বিজ্ঞানচেতনা তাঁকে র(া করেছে। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হতে পারে নি। তিনি তা হতে দেন নি এবং তারপর কাব্যসাধনায় ব্রতী হয়েছেন কোন সমস্যা ব্যতিরেকে। 'বিজ্ঞান থেকে যাঁরা চিত্তের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন তাঁরা তপস্বী - মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, আমি রস পাই মাত্র।' (ঐ) বিজ্ঞান থেকে রসসুধা পান করতে স(ম এমন তপস্বী অতীব বিরল।

রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে এবং বি(পরিচয় রচনার সময়, বিজ্ঞান কর্তৃক আবিস্কৃত জ্ঞানের পটভূমি কেমন ছিল তা জানা প্রয়োজন। ১৮৯৭ সালে বস্তুর (ুদ্রতম কণা পরমাণু ভেঙ্গে আরো (ুদ্র কণা আবিষ্কৃত হয়। ১৯৩২ সালের মধ্যে পরমাণু গঠনকারী তিনটি কণা আবিষ্কৃত হয়। আইনস্টাইন ১৯০৫ ও ১৯১৬ সালে আপে(িকতার দুটি তত্ত্ব প্রকাশ করেন। কোয়ান্টাম তত্ত্বের আবিষ্কার ও উন্মেষ ঘটে ১৯২৪ থেকে ১৯৩০ এর মধ্যে। ভারতীয় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর যুগান্তকারী তত্ত্ব প্রস্তাব করেন ১৯২৬ সালে। বি(পরিচয় গ্রন্থটি তাঁকেই উৎসর্গ করা হয়েছে। বি(তত্ত্ব (কসমোলজি) পৃথক চর্চা হিসেবে ক্র(মশঃ আত্মপ্রকাশ লাভ করছে ১৯১৬ সাল থেকে। এডুইন হাবলের প্রসারণশীল মহাবি(ে ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়। বিগব্যাঙ তত্ত্ব লেমাত্রের ভাবনায় বাসা বেঁধেছে মাত্র। ডারউইনের তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে ১৮৫৯ সালে। জৈব রসায়নের তখন শৈশবকাল চলছে। অ্যামিনো অ্যাসিড জুড়ে পলিপেপটাইড জৈব অণু নির্মাণ শু(হয়েছে ১৯০১ সালে। অজৈব বস্তু থেকে জৈববস্তুর উদ্ভব নিয়ে ওপারিন ১৯২৪ সালে এবং হ্যালডেন ১৯২৯ সালে তত্ত্ব প্রস্তাব করেছেন। মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কে অন্তবর্তী প্রায়-মানুষ প্রাণী নিয়ানডার্থাল-মানবের খবর জানা হল ১৮৮৬ সালে এবং তারপর জাভা-মানব এবং

পিকিং মানবের খবর জানা গেল ১৯২১ সালের মধ্যে। পাশ্চাত্যে সদ্য আবিস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডার এদেশে সুলভ এবং সহজবোধ্য ছিল না বিশেষ করে বিজ্ঞানী মহলের বাইরে।

এমতাবস্থায় তিনি লিখতে বসলেন 'বি(েপরিচয়'। নানা ব্যস্ততার মধ্যে প্রায় ছটি বছর ধরে তাঁকে বিষয়টি চর্চা করতে হয়েছে। তারপর লিখেছেন পরমাণুলোক, ন(ত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক এবং ভূলোকের কথা। অগণিত ন(ত্রের কথা, সূর্য থেকে পৃথিবীর এবং পৃথিবী থেকে চাঁদের জন্মের কথা। বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থের কথা বলেছেন। নিষ্প্রাণ পৃথিবীতে প্রাণের আগমনের কথা বলেছেন। 'উদ্দাম তেজকে শান্ত করে দিয়ে (ু দ্রায়তন গ্রহরূপে পৃথিবী যে অনতি(ু দ্ধ পরিণতি লাভ করেছে, সেই অবস্থাতেই প্রাণ এবং তার সহচর মনের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে, এ কথা যখন চিন্তা করি তখন স্বীকার করতেই হবে, জগতে এই পরিণতিই শ্রেষ্ঠ পরিণতি।' (১৪শ খণ্ড, পৃ-৮৭০) আমরা ল(্য করি যে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সমসাময়িক তথ্য তিনি অগ্রাহ্য করেন নি। অবশ্য সেই সব তথ্য আজ আর ততটা প্রসঙ্গিক নয়। কিন্তু সেটা মূল কথা নয়। মূল কথা হল যে তিনি তখনকার বৈজ্ঞানিক তথ্য স্বীকার করে নিয়েছেন।

উপসংহারে লেখেন - 'অপ্রাণ বি(ে যেসব ঘটনা ঘটছে তার পিছনে আছে সমগ্র জড়জগতের ভূমিকা। মন এইসব ঘটনা জানছে, এই জানার পিছনে **মনের একটা বি(েভূমিকা** কোথায়। পাথর-লোহা-গ্যাসের নিজের মধ্যে তো জানার সম্পর্ক নেই। এই দুঃসাধ্য প্র(নিয়ে বিশেষ একটা যুগে প্রাণ মন এল পৃথিবীতে - অতি(ু দ্র জীবকোষকে বাহন করে।' মনের জানার পিছনে মনের বি(েভূমিকার প্রয়োজনীয়তা কবিভাবনার দার্শনিক দৃষ্টিকোণে।

'পৃথিবীর সৃষ্টি-ইতিহাসে এদের আবির্ভাব অভাবনীয়। কিন্তু সকল কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধহীন একান্ত আকস্মিক কোনো অভ্যুৎপাতকে আমাদের বুদ্ধি মানতে চায় না। আমরা জড়বি(ের সঙ্গে মনোবি(ের মূলগত ঐক্য কল্পনা করতে পারি সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃপদার্থের মধ্যে। অনেক কাল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, আপাতদৃষ্টিতে যেসকল স্থূল জ্যোতির্হীন তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকারে নিত্যই জ্যোতির ত্রি(য়া চলছে। এই মহাজ্যোতিরই সূক্ষ্ম বিকাশ প্রাণে এবং আরো সূক্ষ্মতর বিকাশ চৈতন্যে ও মনে। বি(েসৃষ্টির আদিতে মহাজ্যোতি ছাড়া আর কিছুই যখন পাওয়া যায় না, তখন বলা যেতে পারে চৈতন্যে তারই প্রকাশ। জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলেছে। চৈতন্যের এই মুক্তি(র অভিব্যক্তি(ই বোধ করি সৃষ্টির শেষ পরিণাম।' (ঐ) সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতির হাত ধরে মহাজ্যোতি এবং তারপর চৈতন্যে পৌঁছে যাওয়া তাঁর আধ্যাত্মিকতা। এখানে বিজ্ঞানভাবনা প্রাধান্যলাভ করে নি।

তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বলেন - 'অসীমের মধ্যে কোথা থেকে আরম্ভ হল। অসীমের মধ্যে একান্ত আদি ও একান্ত অন্তের অবি(োস্য তর্ক চুকে যায় যদি মেনে নিই আমাদের শাস্ত্রে যা বলে, অর্থাৎ কল্পে কল্পান্তরে সৃষ্টি হচ্ছে আর বিলীন হচ্ছে, ঘুম আর ঘুম-ভাঙার মতো।' (ঐ) সেই একান্ত আদির কথা জানা আজো সাঙ্গ হয়নি আমাদের। কল্প কল্পান্তরে সৃষ্টির কথাও কল্পনার স্তরে থেকে গিয়েছে। সৌরজগত সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি সর্বাধুনিক যে তত্ত্ব তুলে ধরেছেন - তা হলো জীনস-লিটলটনের বি(দ্ধে হেনরি রাসেলের সমালোচনা। বর্তমানে বিজ্ঞান এই সকল তত্ত্ব বাতিল করে বহুদূর প্রসারিত হয়েছে।

বি(েপরিচয়ে যে সমস্ত তত্ত্বগত আলোচনা হয়েছে আজ তার অধিকাংশই বাতিল হয়ে গিয়েছে। তিনি বিজ্ঞানী নন। বিজ্ঞানে অনেক তত্ত্ব প্রবর্তিত হয় এবং বৃহত্তর তথ্যের আবিষ্কারে প্রাচীন তত্ত্ব বাতিল করে আরো উন্নত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। এখানেই বিজ্ঞানের সজীবতা - জানালা খোলা রাখা। বারবার জানাকে নতুন করে জানার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা। আমাদের প্রাপ্তি হল এই যে রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও তাঁর বিজ্ঞানচেতনা কল্পনাশ্রিত ভাববাদী ভাবনার অন্তরায় হয়ে ওঠেনি এবং তাঁর ভাববাদী ভাবনাও বিজ্ঞানসুলভ ভাবনার অন্তরায় হয়নি। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে তিনি অন্তর্লোকে প্রয়াসী ছিলেন।

।। ৪ ।।

বিজ্ঞানের সত্য সম্পর্কে কবি যতদূর সচেতন ছিলেন তা অপূর্ব কাব্যিক সুষমায় প্রকাশ করে গিয়েছেন অবলীলায়। 'মহাকাশের সঙ্গে কবির অন্তরঙ্গ গভীর পরিচয় যাতে তাঁর কবি-কল্পনা নূতনতর হয়ে উঠেছিল তার সা(্য মেলে নৈবদ্য থেকে জন্মদিনে পর্যন্ত চল্লিশ বছরের কবিতার মধ্যে।' (সূত্র- (ু দিরাম দাস)

সোনার তরী কাব্যগ্রন্থে বসুন্ধরা (১৮৯৩) কবিতায় রয়েছে কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বধৃত সত্য ।

'আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের। তোমার মৃত্তিকা-সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদ(ণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগযুগান্ত ধরি('

বনবাণী কাব্যের নটরাজ কবিতায় লিখলেন - 'নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু।/ পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জিরে বাজিল চন্দ্রভানু।।'

বনবাণীর বসন্ত (১৯২৬) কবিতায় সৌরজগতের গ্রহ প্রদ(ণ এবং ঋতু পরিবর্তনের কথা বললেন - 'সূর্যপ্রদ(ণ করি ফিরে সে পূজার নৃত্যতালে' 'আবর্তিয়া ঋতুমাল্য করে জপ, করে আরাধন/ দিন গুনে গুনে'।

ঐ কাব্যের বৃ(বন্দনা (১৯২৬) কবিতায় বললেন - 'অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান/ প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃ(, আদিপ্রাণ -'। লিখেছেন আদিম ধরণীর কথা - 'বাণীশূন্য ছিল একদিন/ জলস্থল শূন্যতল, ঋতুর-উৎসবমন্ত্র-হীন'। সূর্যের আলো থেকে সালোকসংশ্লে-ষ প্রক্রি(য়ায় বৃ(র খাদ্য উৎপাদন প্রক্রি(য়ার কথা এবং সেই খাদ্য-নির্ভর মানবের কথা লিখলেন -

'টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি(সূর্যালোক হতে -
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বর্ণিলে আলোতে।
ইন্দ্রের অপ্সরী আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি লীলানৃত্যে করেছে বর্ষণ'
' .. জেনেছি - সূর্যের বৃ(জ্বলে বহ্নি(রূপে
সৃষ্টিযজ্ঞে যেই হোম, তোমার সত্তায় চুপে চুপে
ধরে তাই শ্যামস্নিগ্ধ রূপ। ...
... ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী,
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই
যে তেজে ভরিলে মজ্জা মানবেরে তাই করি দান
করেছ জগৎ-জয়ী'

পূরবী কাব্যের সাবিত্রী (১৯২৪) কবিতায় হা(না-মা(জাহাজে বসে বিজ্ঞান ও কাব্যের মিলনপ্রয়াসে উদ্ভাসিত হয়ে লেখেন - 'ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি' 'জ্যোতির কনকপদ্মে' সূর্যর আবির্ভাব 'বহ্নি(বীণা বৃ(লয়ে'। বলেছেন - 'এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান'। বিস্ময়াবিষ্ট কবি বলেন - 'তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভরে কেই বা সে জানে!' তাঁর উপলব্ধি - 'কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে মোর গুপ্ত প্রাণে।' সাবিত্রীর 'দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা'।

শেষ সপ্তক কাব্যের তুমি প্রভাতের শুকতারা কবিতায় দেখি বৈজ্ঞানিক সত্যকে মান্য করেও কবিমানসের অঙ্গীকার কেমন সজীব -

'পণ্ডিত তোমাকে বলে শুক্র(গ্রহ।
বলে, আপন সুদীর্ঘ কৃ(
তুমি বৃহৎ, তুমি বেগবান,
তুমি মহিমান্বিত(
সূর্যবন্দনার প্রদ(ণপথে
তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী,
রবিরশ্মিগ্রথিত দিনরত্নের মালা
দুলছে তোমার কণ্ঠে।'
...
'সেখানে ল(কোটি বৎসর
আপনার জনহীন রহস্যে তুমি অবগুণ্ঠিত।'
...
'আমাদের অজ্ঞাত ঋতুপর্যায়ের আবর্তন
তোমার জলে স্থলে বাষ্পমণ্ডলীতে
রচনা করেছে সৃষ্টিবৈচিত্র্য।'

তারপরে বলেছেন - সে সব জ্যোতিষের সত্য, গণিতের সত্য। আমাদের কাছে সত্য হল তুমি শুকতারা। সন্ধ্যাতারা।

পত্রপুটের পৃথিবী (১৯২৮), উদাসীন (১৯২৯) কবিতায় বর্তমান এমনি বিজ্ঞানভাবনা এবং তা কাব্যের মাধুর্য (ুন্ন না করে। শ্যামলীর আমি (১৯৩৬) কবিতায় বললেন - 'আমার চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ/ চুনি উঠল রাঙা হয়ে।' সেই চিরন্তন প্রশ্নটি এখানে উত্থাপিত - জগত কি বস্তুনিরপে(নাকি মানব-সাপে(? মানবচেতনার রঙেই বস্তুজগতের অভিজ্ঞতার স্বাদ। আইনস্টাইনের সঙ্গেও এ নিয়ে তাঁর বিতর্ক হয়েছিল।

আবার আফ্রিকা (১৯৩৬) কবিতায় বললেন পৃথিবীর সৃষ্টিপর্বের কথা যখন নতুন সৃষ্টি বারবার বিধ্বস্ত হচ্ছিল, ঘন-ঘন মাথা নাড়ার দিনে (ভূমিকম্পে)। আর (দ্র সমুদ্রের বাহু একদা প্রাচী ধরিত্রীর বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল আফ্রিকা মহাদেশটি। একথ যখন বলেন, তখন মহাদেশীয় বিচরণের কথাটিই কাব্যিক মাধুর্যে প্রকাশ করেন।

'উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা নাড়ার দিনে
(দ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুক থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা -'

সৃষ্টির বিপর্যয়ের কথা বিজ্ঞান থেকে গ্রহণ করেছেন বটে, তবে তা স্রষ্টার অভিজ্ঞান হিসেবে।

।। ৫ ।।

বিজ্ঞানের কার্যকারণ সম্পর্কটি তাঁর উপলব্ধির ভিতরে দৃঢ়ভাবে ছিল বলে কাব্যে ও

অন্যান্য রচনায় বিজ্ঞানের যুক্তি(বাদী প্রত্যয় সহসা ব্যাহত হতে পারে নি। বোধ হয় সেকারণে অন্ধতা মূঢ়তা জড়তা মৌলবাদী ধ্যানধারণা যুক্তি(বাদ-বিরোধিতা কুসংস্কার জাতপাতের সমস্যা ইত্যাদি নানা বিষয়কে তিনি সহজে আত্র(মণ করতে পেরেছেন।

নব্য হিন্দুয়ানীর বি(দ্ধে ১৮৭৭ সালে 'চিঠিপত্র'তে ে(-যাত্মক ভাবে লেখেন - 'আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় সিদ্ধান্তই শাণ্ডিল্য-ভৃগু-গৌতমের জানা ছিল ... আমাদের বৈদিক পৌরাণিক যুগ যে চলিয়া গেছে এ বড়ো দুঃখের বিষয় ...।' (সূত্র ঃ বাংলার রেনেসাঁস)

১৮৯১ সালে লেখা হয় 'প্রাচ্য সমাজ'। পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে তুলনা করে তিনি দেখান যে সেখানে স্বাধীন বুদ্ধির জয় হয় কেননা সেখানে মনুষ্যের গৌরব বর্তমান। প্রাচ্যের বুদ্ধিহীন অব(দ্ধ সমাজে তা হয় না। 'য়ুরোপে এসিয়ায় প্রধান প্রভেদ এই যে, য়ুরোপে মনুষ্যের একটা গৌরব আছে, এসিয়াতে নাই। ... তাই সেখানে রাজার একাধিপত্য ভাঙ্গিয়া আসে, পুরোহিতের দেবত্বের বি(দ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং গু(বাক্যের অভ্রা ন্তিকতার উপর স্বাধীন বুদ্ধি জয়লাভ করে। ... যে সকল বৃহৎ দোষ স্বাধীন সমাজে থাকে তাহা তেমন ভয়াবহ নহে, স্বাধীন বুদ্ধিহীন অব(দ্ধ সমাজে তিলমাত্র দোষ তদপে(া সাংঘাতিক।' (ঐ) স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির উপর এই গভীর আস্থা তাঁর যুক্তি(বাদী মননের ফলশ্রুতি।

'কর্মের উমেদার' (১৮৯১) রচনায় দ্বিধাহীনভাবে লেখেন - 'মনু-পরাশর-ভৃগু-নারদ সকলে মিলিয়া আমাদের আত্মকর্তৃত্ব চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন'। ১৯১১ সালে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ (দ্ধচিত্তের কারণ দশাতে লেখেন - 'জগতের যেখানেই ধর্মকে অভিভূত করিয়া আচার আপনি বড়ো হইয়া উঠে সেখানেই মানুষের চিত্তকে সে (দ্ধ করিয়া দেয় ... দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তি(কে ধর্মকে চারিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে ..।'

'ধর্মশি(া' রচনায় তিনি উপলব্ধি করেন - 'বিজ্ঞান ইতিহাস ও সামাজিক আচারকে আমরা কোনো মতেই শাস্ত্রসীমার মধ্যে খাপ খাওয়াইয়া রাখিতে পারিব না। এমন অবস্থায় আমাদের দেশেও প্রচলিত ধর্মশি(ার সহিত অন্য শি(ার প্রাণান্তিক বিরোধ ঘটিতে বাধ্য।' তাহলে কর্তব্য কর্ম কী? শাস্ত্রসীমার গণ্ডী অতিত্র(ম করা। সেই ল(্যে অন্তিম জীবনে তিনি নানা ধর্মের উর্ধে এক বৃহত্তর মানবধর্মের সন্ধান করেছিলেন। কোন সম্প্রদায় নয় বা প্রাতিষ্ঠানিক আচারসর্বস্ব ধর্মব্যবস্থা নয়। তিনি জানেন 'মহাপু(ষেরা ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, আর আমরা তাহার মধ্য হইতে সম্প্রদায়টাই লই, ধর্মটা লই না।' তিনি সম্প্রদায় বর্জন করে ধর্ম গ্রহণ করতে আকুল হলেন।

অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃ(তায় তিনি বলেন 'দ্য রিলিজিয়ন অব ম্যান'। ১৯৩৩ সালে কলকাতা বি(বিদ্যালয়ে কমলা বক্তৃ(তায় 'মানুষের ধর্ম'। ভূমিকায় বললেন - 'স্বার্থ আমাদের যেসব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে(যা আমাদের ত্যাগের দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।'

'আমাদের অন্তরে এমন একজন আছেন যিনি মানব অথচ তিনি ব্যক্তি(গত মানবকে অতিত্র(ম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টিঃ', তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব।' (ঐ) ব্যক্তি(মানব অতিত্র(ম করে তিনি যে বি(্বমানবতাকে ডাক দিলেন, আইনস্টাইনের সঙ্গে আলাপচারিতায় আমরা তারই আভাষ পাই।

ধর্মভাবনাই হোক বা বিজ্ঞানভাবনা, গোঁড়ামি বর্জন করে মুক্ত(মনে চলার কথাটি তাঁর কাছে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। বলেছেন যে 'একদিন য়ুরোপের ধর্মমূঢ়বুদ্ধি জিয়োর্ডানো ব্রুনোকে পুড়িয়ে মেরেছিল', 'যে চিত্তকে সে যুগের সাম্প্রদায়িক জড়বুদ্ধি দল বেঁধে অস্বীকার করেছিল' তাকেই 'আজ সর্বমানব সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে।'

'ধর্মের নিত্য আদর্শকে শ্রদ্ধা করি বলেই ধর্মমতকেও নিত্য বলে স্বীকার করতে হবে এমন কথা বলা চলে না। ভৌতিক বিজ্ঞানের মূলে নিত্য সত্য আছে বলেই বৈজ্ঞানিক মতমাত্রই নিত্য, এমন গোঁড়ামির কথা যদি বলি তা হলে আজও বলেতে হবে সূর্যই পৃথিবীকে প্রদ(িণ করছে। ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণত এই ভুলই ঘটে(সম্প্রদায় আপন মতকেই বলে ধর্ম, আর ধর্মকেই করে আঘাত।' (মানুষের ধর্ম)

তিনি সচেতন ছিলেন যে একদা 'য়ুরোপে মধ্যযুগে শাস্ত্রগত ধর্মবি(্বাসকে অবিচলিত রাখার জন্য' আসলে 'বিজ্ঞানবিরোধী ও ধর্মবি(দ্ধ উৎপীড়ন আচরিত' হয়েছিল। (ঐ)

বিজ্ঞানই হোক বা ধর্ম 'আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি শোধন করি তা মানবচিত্ত কখনোই ছাড়তে পারে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে **প্রমাণিত বিজ্ঞান**, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও **মানবচৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ**।' (ঐ)

১৯১১ সালে 'ধর্মের নবযুগ' প্রবন্ধে তিনি বলেন - 'এদিকে তখন বিজ্ঞান বাহিরের বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের বেড়া ভাঙিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ... জগতে কোনো বস্তুই নিজের বিশেষত্বের ঘেরের মধ্যে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া নাই। বাহিরে তাহার বিশেষত্ব আমরা যেমনই দেখি না কেন, কতকগুলি গূঢ় নিয়মের ঐক্যজালে সে ব্রহ্মাণ্ডের দূরতম অণু-পরমাণুর সহিত নাড়ির বাঁধনে বাঁধা। ... এইজন্য যে বি(্বের কোনো একটি কিছুর তত্ত্ব সত্য করিয়া জানিতে গেলে সবকটির সঙ্গে তাহাকে বাজাইয়া দেখিতে হয়। বিজ্ঞান সেই উপায় ধরিয়া সত্যের পরখ করিতে লাগিয়া গেছে।' বিজ্ঞানের এই সর্বত্রগামী একীভূত ভাবনার শরিক হতে কুণ্ঠিত প্রথানুগ ধর্মীয় ভাবুকগণ। 'তাই মানুষ বলিতে লাগিল জড়পর্যায়ে যেমনই হক না কেন, জীবপর্যায়ে বিজ্ঞানের ঐক্যতত্ব খাটে না'। (সঞ্চয়)

কালান্তর প্রবন্ধে বলছেন - 'উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ করব কি করে, কারণ সবই তো

তৈরী হয়েছে ঐ আদিম, পরম বস্তুকণা দিয়ে সুতরাং সবাই সবার আত্মীয়।' সমগ্র বিশ্বজগত এক গূঢ় নিয়মের ঐক্যজালে গ্রথিত - সামগ্রিক দৃষ্টিকোণে তাকে দর্শন করতে হবে।

।। ৬ ।।

আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে যে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয় তার মূলমন্ত্র - যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্। বিশ্ব যেখানে এক নীড়ে পরিণত হয়েছে। ১৯১৩ সালে তিনি এক চিঠিতে 'মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করে তার আদর্শ' প্রচারের সঙ্কল্প করেন। প্রকৃত শি(ার জন্যে বিজ্ঞান শি(া প্রয়োজন। সে জন্যে তিনি স্বয়ং লেখনী ধরেছিলেন। নিদা(ন অর্থাভাবের মধ্যেও চেষ্টা করেছেন পরী(াগারের। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শি(ার জন্যে বিদেশে পাঠিয়েছেন। উৎসাহ এবং সাহায্য করেছেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রকে। একজন কবির প(এবম্বিধ চেতনা বিশেষ অর্থবহ।

একদিকে তিনি ধর্মানুগ ভাবনার শরিক কিন্তু প্রতিষ্ঠানগত ধর্মে আস্থা নেই। মূলত তিনি বৃহত্তর মানবধর্মে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। অন্যদিকে স্বচ্ছ উদার এবং সংস্কারমুক্ত হওয়ার তাগিদে বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া এবং বিজ্ঞান সাধনা করা প্রয়োজন সেকথাও নানা রচনায় এবং ক্রি(য়াকর্মের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন।

।। ৭ ।।

কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের একাধিকবার সা(াৎ হয়েছিল। তার মধ্যে ১৯৪০ এর ১৪ জুলাইর সা(াৎটি সমধিক উল্লেখযোগ্য কেননা একমাত্র সেবারে বেশ কিছু মনোজ্ঞ আলোচনা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে। উক্ত কথোপকথনে সত্য-বাস্তবতা সম্পর্কে কবির ভাবনার সঙ্গে বিজ্ঞানীর ভাবনার বৈসাদৃশ্য ল(্য করা যায়। অন্যথায় বিজ্ঞান সচেতন কবির সত্য-বাস্তবতা-সুন্দর ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তাভাবনার গতিমুখ কোন দিকে তার চমৎকার হদিশ মেলে। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানভাবনা ও তাঁর দর্শনচিন্তার পরিমাপ করতে এই আলোচনাটি অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ।

কোন এক সংবাদে প্রকাশ আইনস্টাইন নাকি শু(তেই কবিকে প্র্ন করেছিলেন - আপনি কি জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন?

রবীন্দ্রনাথ উত্তরে বলেন - না বিচ্ছিন্ন করে নয়। সমগ্র বিশ্ব বোধ্য হয় মানুষের অনন্ত ব্যক্তি(ত্বের কাছে। এমন কিছু হতে পারে না যা মানুষের ব্যক্তি(ত্বের আয়ত্তাধীন নয় এবং তাতে প্রমাণিত হয় যে বিশ্বের সত্য মানবিক-সত্য। ল(্যনীয় তাঁর 'মানুষের অনন্ত ব্যক্তি(ত্ব' কথাটি। তিনি বোধ হয় অনন্ত মানবসত্তার কথা বলতে চেয়েছেন পরে যাকে বলেছেন সর্বজনীন মন।

আইনস্টাইন বিজ্ঞান-দর্শনের মূল প্র্ন তুলে বলেন - বিশ্বের স্বরূপ কী তা নিয়ে দুটো স্বতন্ত্র ধারণা আছে - হয় এই জগত মনুষ্য- নির্ভর একীভূত সত্তা অথবা মানব-নিরপে(স্বতন্ত্র বাস্তবতা। (আমরা স্মরণ করতে পারে ঠিক এই প্র্নে তাঁর সঙ্গে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের অন্যতম প্রবক্তা নীলস বোরের বিতর্ক ছিল আজীবন।)

রবীন্দ্রনাথ এই দুটি ধারণার মধ্য থেকে কোন একটি ধারণা চয়ন করেন নি। তিনি বললেন এক চিরন্তন মানুষের কথা, তার সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গতির কথা। বললেন - আমাদের বিশ্ব যখন চিরন্তন মানুষের সঙ্গে সঙ্গতি (harmony) লাভ করে তখন তাকে আমরা সত্য বলে জানি, সুন্দর বলে অনুভব করি।

বিশ্ব সম্পর্কে এই প্রকার ধারণা নিতান্ত মানবিক ধারণা। কবির কাছে ঐ মানবিক ধারণাই একমাত্র সত্য বলে গ্রাহ্য। তিনি বললেন - এই জগত মানবিক জগত। এর বিজ্ঞানসম্মত ধারণাও বৈজ্ঞানিক মানুষের ধারণা। সুতরাং আমাদের বাদ দিয়ে জগতের আর কোন অস্তিত্ব নেই। এ হল এক আপে(ক জগত যার বাস্তবতা আমাদের চৈতন্যের উপর নির্ভর করে আছে। যুক্তি এবং অভিজ্ঞতার এক মাপকাঠি আছে সত্য নির্ণয়ের জন্যে এবং তা হল **চিরন্তন মানুষের** মাপকাঠি আর আমাদের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সেই **চির-মানবের** অভিজ্ঞতা হয়।

কিন্তু সেও তো মানবিক সত্তার উপলব্ধি। কবি বললেন - হ্যাঁ, এক **অনন্ত সত্তার** (উপলব্ধি)। ভাবাবেগ এবং কাজকর্মের মধ্য দিয়ে আমাদের তা বুঝতে হবে। সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়েই আমরা সেই **পরম-মানবকে** উপলব্ধি করতে পারি যার মধ্যে ব্যক্তি(মানুষের সীমাবদ্ধতা নেই। ব্যক্তি(র মধ্যে আবদ্ধ নয় যে বিষয়গুলি তা নিয়ে বিজ্ঞানের কাজকর্ম - ফলে তা হল সত্যের নৈর্ব্যক্তি(ক মানব-জগত। ধর্ম এই সত্যগুলি অনুধাবন করতে পারে এবং আমাদের গভীরতর প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে। আমাদের ব্যক্তি(গত সত্যবোধ তখন সর্বজনীন তাৎপর্য লাভ করে। ধর্ম সত্যের উপর মর্যাদা আরোপ করে এবং আমরা সত্যকে কল্যাণকর রূপে জানি তার সঙ্গে আমাদের নিজস্ব মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে।

বিজ্ঞানী আরো স্পষ্ট করে প্র্ন তুললেন - তাহলে সত্য বা সুন্দর মানব-নিরপে(নয়? যদি মানুষের কোন অস্তিত্ব না থাকে তবে বেলভিডিয়ারের অ্যাপোলো আর সুন্দর থাকবে না? কবি বললেন - না।

আইনস্টাইন সৌন্দর্যের এই ধারণার সঙ্গে একমত হলেও সত্যের (ে ত্রে তা মানতে পারেন না। কবি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেন - সত্যও তো মানুষের মধ্য দিয়েই উপলব্ধ হয়।

একথা সত্য যে সত্য-বাস্তবতা মানুষের মধ্য দিয়েই উপলব্ধ হয়। একথাও সত্য যে সেই উপলব্ধির মাধ্যমে একথাও একত্রে উপলব্ধ হয় যে মানুষের অবর্তমানেও এই বিশ্ব বর্তমান

ছিল, আছে এবং থাকবে। অর্থাৎ মানুষ না থাকলে বেলভেডিয়ারের অ্যাপোলা বা ন(ত্র-গ্রহ-উপগ্রহ থাকবে। সুন্দর-অসুন্দর থাকবে না তবে তাদের অস্তিত্ব থাকবে। বিজ্ঞানী অবশ্য সে সব কথা বলেন নি। তিনি বললেন - প্রমান করতে পারবো না যে আমার ধারণা সঠিক কিন্তু এটাই আমার ধর্ম।

ধর্ম বলতে হয়তো বিজ্ঞানীর ধর্ম একথা বোঝাতে চেয়েছেন। কবির ব্যাখ্যা - সৌন্দর্য নিখুঁত সঙ্গতির (perfect harmony) আদর্শে নিহিত যা **সর্বজনীন সত্তায়** বর্তমান(সত্য হচ্ছে **সর্বজনীন মনের** নিখুঁত উপলব্ধি। আমরা ব্যক্তি(মানুষেরা নিজস্ব ভুলভ্রান্তির ভিতর দিয়ে, আমাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, আমাদের আলোকিত চৈতন্যের ভিতর দিয়ে তার দিকে অগ্রসর হই। এছাড়া সত্য জানার আর কী উপায় আছে?

সত্য জানার আর কোন উপায় নেই বলে এইভাবে জানার পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে এমনতরো ভাবনার বনিয়াদ খুব পোক্ত(বোধ হয় না। আইনস্টাইন সেকথায় না গিয়ে বললেন - আমি প্রমাণ করতে পারবো না তবে বি(্বাস করি পিথাগোরিয়ানদের যুক্তি(তে যেখানে সত্য মানব-নিরপে(। এটা হল ন্যায়ের সন্ততির (ধারাবাহিকতার) সমস্যা।

কবির কথায় - সত্য **সর্বজনীন সত্তার** থেকে অভিন্ন এবং অবশ্যই মূলগতভাবে মানবিক। তা না হলে ব্যক্তি(হিসেবে যা কিছু আমরা সত্য বলে উপলব্ধি করি তাকে কখনোই সত্য বলা যেত না। অন্ততপ(সেই সত্য যাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলা হয় - যা যুক্তি(র প্রক্রি(য়ার সাহায্যে অর্থাৎ মানবিক মননের কোন অঙ্গের সাহায্যে অনুধাবন করা যায়। ভারতীয় দর্শনে **পরম সত্যকে** বলা হয়েছে ব্রহ্ম(বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি(মনের দ্বারা ব্রহ্মের ধারণা করা যায় না বা কথার দ্বারা তার বর্ণনা করা যায় না(কেবল ব্যক্তি(কে তার অনন্তের মধ্যে মিশিয়ে দিতে পারলে তবেই তার উপলব্ধি হয়। কিন্তু এই ধরণের সত্য বিজ্ঞানের সত্য হতে পারে না। যে সত্য নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তা হল এক প্রকার **প্রতীয়মানতা**(অর্থাৎ মানুষের মনে যা সত্য বলে প্রতিভাত হয় এবং সেকারণে তা মানবিক, এবং তাকে আমরা **মায়া** বা **বিভ্রম** বলতে পারি।

যদি বলা হয় যে সেই বিভ্রম তো ব্যক্তি(র নয় সমগ্র মনুষ্যজাতির, তার উত্তরে বলতে হবে - প্রজাতিও এক বৃহত্তম ঐক্যের ও মানবতার অন্তর্গত। তাই সমগ্র মানবমনই সত্য উপলব্ধি করে থাকে। এক সাধারণ উপলব্ধির মধ্যে ভারতীয় মন আর ইয়োরোপীয় মন এসে মিলিত হয়।

কবি যাই বলুন না কেন বিজ্ঞানীর কাছে মূল সমস্যা হচ্ছে - সত্য মানবচৈতন্য-নিরপে(কি না। কবি বলেন - বাস্তবতার বিষয়মুখ (অবজেক্টিভ) এবং আত্মমুখ (সাবজেক্টিভ) এই দুই দিকের যুক্তি(সিদ্ধ সাযুজ্যের মধ্যে আমরা যাকে সত্য বলি তার অবস্থান। দুটি দিকই আবার **পরাব্যক্তি(ক মানুষের** (সুপারপার্সোনাল ম্যান) অঙ্গীভূত।

বিজ্ঞানী যুক্তি(দেখান - এমন অনেক বাস্তবতা মন স্বীকার করে নেয় যা তার বহির্ভূত, যার অস্তিত্ব তার অপে(া রাখে না। যেমন বাড়িতে কেউ না থাকতে পারে তবু ওই টেবিলটা যেখানকার সেখানেই থেকে যায়।

কবি মানেন যে তা ব্যক্তি(মনের বাইরে থাকে। তবে তিনি যে 'সর্বজনীন মন'কে বি(্বাস করেন তার বাইরে থাকে না। টেবিলটা কোনও-এক ধরণের চেতনায় দৃষ্টিগ্রাহ্য থেকে যায়।

বিজ্ঞানী বলেন - বাড়িতে যদি কেউ না থাকত, তবু টেবিলটা ঠিকই থেকে যেত। কিন্তু আপনার দৃষ্টিভঙ্গীতে তা অবৈধ কেননা আমাদের বাদ দিয়ে টেবিলের থাকা বলতে ঠিক কী বোঝায় তা বলতে পারি না। মানুষ এড়িয়ে সত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা বা প্রমাণ হয় না। কিন্তু এটা এমন এক বি(্বাস যা কেউ এড়াতে পারে না, এমন কি আদিম মানুষও না। সত্যের উপর আমরা অতিমানবিক বাস্তবতা (অবজেক্টিভিটি) আরোপ করি। ব্যাপারটা অর্থাৎ এই বাস্তবতা আমাদের কাছে অপরিহার্য কেননা তা আমাদের অস্তিত্ব এবং আমাদের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের মনের উপর নির্ভর করে না। যদিও এর অর্থ কী তা বলতে পারি না আমরা।

কবি বলেন - মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক-শূন্য কোনও সত্য যদি থাকে তবে আমাদের কাছে তা সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন।

দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানী মানবনিরপে(সত্য ও বাস্তবতার অস্তিত্ব মানেন। কবি সবকিছুই মানবিক সত্য বলে মনে করেন। মানেন সর্বজনীন মনের চিরমানবকে, এক পরাব্যক্তি(ক মানবকে। এই সর্বজনীন মন বা চিরমানব বা পরাব্যক্তি(ক মানবের তাৎপর্য কী? মানবিক সত্যের মধ্যে থেকে যদি কোন সর্বজনীন মনকে মান্য করা যায় তবে মানবনিরপে(বি(্বপ্রকৃতির অস্তিত্বও নির্ণীত হতে সমস্যা কোথায়? কবির বি(্বাস - অনন্ত সর্বজনীন কোন সত্তার সঙ্গে মানবসত্যের সংযোগ বর্তমান।

বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানভাবনার সঙ্গে বি(্বকবির বিজ্ঞানভাবনায় এখানেই রয়েছে মৌলিক প্রভেদ। কবিগু(বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ একটা পর্যায় পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন এবং তা তাঁর দার্শনিক মনের সঙ্গে সঙ্গতি র(া করে। তারপরে আর নয়। মানুষের আবির্ভাবের আগে বি(্বের অস্তি ত্ব ছিল সূর্য-চন্দ্র-পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল এ জ্ঞান কবিগু(র ভাষ্যে মানবিক সত্য এবং তা সঠিক। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রমাণিত হয় মানবনিরপে(সূর্য-চন্দ্র-পৃথিবীর অস্তিত্ব যেমন বিজ্ঞানী বলতে চেষ্টা করেছেন। তাও সত্য। সুন্দরের ব্যাখ্যা একান্ত মানবনির্ভর বটে বাস্তবতা ও অস্তিত্বগত অবস্থান মানবিক সত্যমতেই কালদণ্ডের পরিমাপে মানবনির্ভর নয়।

।। ৮ ।।

সামগ্রিকভাবে কবির চেতনায় এক ভগবৎসত্তার অস্তিত্ব ছিল সংশয়াতীত কিন্তু নানা রূপে প্রকাশিত। সেই পরমপিতা কখনো পিতা কখনো প্রভু নাথ স্বামী বা জীবনদেবতা সম্বোধনে অভিহিত হয়েছেন। কখনো তিনি ভারতদেবতা বা বঙ্গজননীর উপাসক বা প্রেমের শরিক। গীতাঞ্জলী পর্বে এসেছে উপনিষদের পরমসত্তা, বৈষ(বীয় ভক্তি(বাদ, মরমীয়া সাধনা, সন্তসাধকদের আউলবাউলের দর্শন। শেষ জীবনে সবই পরিণত হয়েছে বি(েদেবতায়, পু(ষ, মানব তথা মহামানবে। মানবধর্মে। দীর্ঘ জীবনকালে তাঁর উত্তরণ ঘটেছে এক পটভূমি থেকে বৃহত্তর পটভূমিতে। আরেকদিকে দেখা যায় তাঁর অসামান্য বিজ্ঞানচেতনা তাঁকে কুসংস্কার মুক্ত(হতে সাহায্য করেছে। ঐক্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। বি(েমানবতার ভাবনায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে নি। উভয়ের সহাবস্থান ও সামঞ্জস্যবিধান হয়েছে সুন্দর নিপুণতায়।

আসলে কবিগু(র আয়ত্তে ছিল সংস্কারমুক্ত(মানসিকতা। সেকারণে নানা স্তরের চিন্তাভাবনা অবিরত তরঙ্গ তুলেছিল তাঁর মনে। যেহেতু তিনি আঁকড়ে বসে ছিলেন না কোন একটি নির্দিষ্ট মতবাদ, ছিলেন না বসে ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে তাই মুক্ত(চিন্তায় ভাসতে ভাসতে সামান্য থেকে অসামান্যে, মহৎ থেকে মহত্তর ভাবনায় উন্নীত হতে পেরেছিলেন। তাঁর অবিচল বিচরণ ঘটেছিল ক্র(মশঃ উর্ধ্বলোকে। স্থানকালের গণ্ডীতে বদ্ধ হলেও তিনি কাল থেকে কালান্তরে উত্তীর্ণ। নানা ভাবনা থেকে সঞ্জাত নির্যাস আহরণ করে সামগ্রিক ভাবনায় উপনীত হতে পেরেছিলেন। তার সবটুকু সবার মান্য না হতে পারে কিন্তু সবাইকে তা বৃহত্তর ভাবনায় বিচলিত এবং উদ্দীপ্ত করতে স(ম বলে আমরা সকলেই তাঁর কাছে চিরঋনী।

(চিহ্নি(ত ও বলিষ্ঠ হরফ লেখকের। সূত্র - (১) রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান - দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়((২) রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান (সেমিনার গ্রন্থমালা) - শঙ্কর চক্র(বর্তী, অলোক সেন ও (ুদিরাম দাস((৩) রবীন্দ্ররচনার দর্শনভূমি - গুণময় মান্না((৪) ধর্মভাবনা বিজ্ঞানভাবনা (পাণ্ডুলিপি) - বিপুল সাহা।)

(অনুভাব, রবীন্দ্র ১৪০৯)